সভাপতির ভাষণ

রাষ্ট্র ও বাজার ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে

মইনুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের শ্রদ্ধেয় উদ্বোধক মাননীয় বিচারপতি হাবিবুর রহমান, সম্মেলন-অভিভাষণ প্রদানকারী বরণীয় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান, সম্মেলনের সম্মানিত অতিথি, আমন্ত্রিত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সমিতির সভাপতি হিসেবে আপনাদেরকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সোচ্চার ও সঠিক অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তার জন্মলগ্ন থেকে সাহসিকতার সাথে সত্য উচ্চারণের এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আর, সঠিক সময়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ ভিত্তিক আরো কিছু সত্য উদঘাটন ও উচ্চারণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে আজ শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠেয় সমিতির চতুর্দশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতায় রাষ্ট্র ও বাজার কী ভূমিকা পালন করা বাঞ্ছনীয়৩ এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজতে গেলে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা স্বাভাবিক ভাবেই প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠবে। কারণ, বিষয়টি প্রকৃত বিচারে Normative Economics এর বিষয়বস্তু। কিন্তু রাষ্ট্র ও বাজার আসলে দুটো পরিপূরক প্রতিষ্ঠান, এ দুটোকে mutually exclusive বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানোর মতাদর্শিক hang-over কে জবরদস্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াতেই এ-সম্পর্কীয় বিশ্লেষণ বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ-সম্মেলনে যদি বিভ্রান্তির কুজ্‌ঝটিকা খানিকটাও অপসৃত হয়, তাহলে আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করব। সম্মেলনের কর্ম-অধিবেশন গুলোতে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের জন্য এটুকু বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিকামী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের দর্শনের মোহে বাঙ্গালী মুসলমানকে আকৃষ্ট করতে পারার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তির আকুতি; তাই মোহভঙ্গের পালাও শুরু হয়েছিল সদ্য-স্বাধীন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকদের আচরণ ও নীতিতে পূর্ব বাংলার প্রতি নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক

দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃ প্রকাশের মাধ্যমে। ভাষা নিয়ে পূর্ব বাংলার প্রকাশ্য বিদ্রোহটা শুরু হলেও পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক প্রভুসুলভ আচরণটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল নির্বিচার অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমেই, যেখানে পূর্ব বাংলা থেকে সম্পদ পাচার এবং পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ক্রমেই বঞ্চনার চিত্রটাকে জনগণের চেতনার গভীরে প্রোথিত করেছিল। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয়দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সনদ হিসেবে অভিহিত হয়ে ঘনায়মান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল ওগুলোতে ঐ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের জোয়াল থেকে মুক্তির দিক্ নির্দেশনা ছিল বলেই। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত ছাত্রদের এগার দফায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের জনগণের আরো পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচীগুলো সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক মূল এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতিহারে ছয় দফা এবং এগার দফা কর্মসূচীগুলো অবিকৃতভাবে স্থান লাভ করায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়কে ঐ কর্মসূচীগুলোর সমর্থনে জনগণের ঐতিহাসিক ম্যান্ডেট হিসেবে বিবেচনা করার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ, এবং রেসকোর্স ময়দানের বিজয় ও শপথ অনুষ্ঠানের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ শপথ নিয়েছিলেন এই ম্যান্ডেটের ব্যাপারে কোন আপোষ না করার ।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের ঘোষণা মতে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বাঙালী জাতীয়তাবাদকে চতুর্থ রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় অগ্রসর হয়েছিল, এবং তদনুসারেই রচিত ও গৃহীত হয়েছে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান। ২০০২ সালের আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্র শুধু নামে 'গণপ্রজাতন্ত্র' হিসেবে বহাল থাকলেও রাষ্ট্রের চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল হয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল হয়ে গেছে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু হয়ে গেছে, সমাজতন্ত্রের জলো বিশেষণ হিসেবে যুক্ত হয়েছে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার"। এর সাথে ১৯৯১ সাল থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন দেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বি এনপি'র ঘোষিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০০২ সালের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে ঃ "রাষ্ট্র ও বাজার ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে" ।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের চারিত্র

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্বায়নের রথে চড়ে এক্ষণে বিশ্ব জয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নব্য ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ ; শিল্পোন্নত ৩০-৩৫ টি দেশ পুঁজি ও পণ্যের বিশ্বব্যাপী প্রবাহকে ক্রমান্বয়ে অবাধ করার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন জোরদার করার এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রধান ফায়দাভোগী। আধিপত্য ও পরনির্ভরতার (Dominance and Dependence) আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এই সম্পর্কের জটাজাল তৃতীয় বিশ্বে দিন দিন হস্ত ক্ষেপমূলক ও আগ্রাসী রূপ ধারণ করছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর সমর্থনে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, ডব্ল্য টি ও কিংবা উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলোর বড় ভ্রাতা সুলভ মুরব্বীয়ানা তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলোকে আবারো অদৃশ্য ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলেছে। এই নয়া- সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রান্তস্থ অবস্থানে বাংলাদেশ সামীর আমিনের তত্ত্বের একটি প্রান্তীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (Peripheral Capitalist State) হিসেবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শনকে গ্রহণ করেছে পঁচাত্তর পরবর্তী শাসক মহলগুলোর রাজনৈতিক অবস্থান ও মতাদর্শিক ঝোঁকের অনুকূল মেল বন্ধনের মাধ্যমে। Privatisation, Deregulation, Liberalisation এবং Globalisation এর মত চটকদার স্লোগানধারী অর্থনীতির সর্বরোগহর কাঠামোগত সংস্কারের প্রেসক্রিপশন বাংলাদেশকেও গেলানো হয়েছে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' নামের আড়ালে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার মিশনে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রের এই মুৎসুদ্দী (Comprador) চরিত্রের কারণেই এই রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতিতে, সমাজ ব্যবস্থায় ও উৎপাদন পদ্ধতিতে কার্ল মার্কস বর্ণিত জাতীয় বুর্জোয়ার (National Bourgeoisie) প্রসার না ঘটিয়ে বহুজাতিক করপোরেশনের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ থেকে মুনাফা আহরণকারী পল বারান বর্ণিত বাণিজ্য নির্ভর মুৎসুদ্দী পুঁজিপতির (Comprador Bourgeoisie) বিকাশকেই সযত্নে লালন করে চলেছে। তাই দেখা যাবে, এই রাষ্ট্র অর্থনীতির তাবৎ উৎপাদনশীল খাতের উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই পৌঁছে দিচ্ছে মুৎসুদ্দী বণিকের কাছে, দুর্নীতিবাজ আমলার অনুপার্জিত খাজনা হিসেবে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা কালোটাকার সাম্রাজ্যে, সন্ত্রাসী-মাস্তান-চাঁদাবাজের বা চোরাচালানির রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার চক্করে কিংবা লুটেরা রাজনীতিকদের মার্জিন শিকারের অর্থে উপচে পড়া গোপন সিন্ধুকে ও বিদেশের ব্যাংক একাউন্টে। সরকারী রাজস্ব ও ব্যয় ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উদারীকরণ কিংবা অন্যবিধ নীতি গ্রহণ ও পরিবর্তন-সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের এহেন ভূমিকা আজ দুঃখজনক ভাবে স্পষ্ট। প্রান্তীয় পুঁজিবাদ (Peripheral Capitalism) মার্কস বর্ণিত বলিষ্ঠ, প্রতিযোগিতমূলক, উদ্ভাবনমুখী ও উদ্যোগী পুঁজিবাদ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ হলো বিকৃত, দুর্বল, পরনির্ভরতা জর্জরিত, মুৎসুদ্দী পুঁজি অধ্যুষিত ব্যবস্থা, যা বর্তমান নব্য-ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বাংলাদেশের মত প্রান্তীয় অবস্থানের অনুন্নত দেশে আন্তর্জাতিক পুঁজির উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, খনিজ দ্রব্য, বনজ দ্রব্য ও শ্রমের যোগান অবাধকরণ এবং পুঁজির লোভনীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র সৃষ্টিতে ভূমিকা পালনে প্রধানত তৎপর রয়েছে। তাই প্রান্তীয় পুঁজিবাদ অনুন্নয়ন ঘটায়, উন্নয়নে সহায়তা করে না। বহুজাতিক কর্পোরেশনের এ দেশীয় ছোট তরফ বলেই মুৎসুদ্দী পুঁজি শিল্পায়নে অবদান না রেখে আমাদের মত দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হিসাবে আহরিত উদ্বৃত্ত বিনিয়োগযোগ্য পুঁজিকেও বৈধ-অবৈধ বাণিজ্যে পাচার করে দেবে, বা অনুৎপাদনশীল ভোগে বা বিদেশে পুঁজি পাচারের মত কার্যক্রমের মাধ্যমে এই উদ্বৃত্তের অপচয়ে ভূমিকা রাখবে।

আমাদেরকে প্রদত্ত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আর একটি মারাত্মক উত্তরাধিকার উপমহাদেশের দেশগুলোতে তাদের রেখে যাওয়া অতি বিকশিত ও সংগঠিত সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের শক্তিধর অবস্থান এবং তুলনামূলকভাবে অবিকশিত 'শ্রেণীসমূহ', যার ফলে এ সব দেশে উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সামরিক বাহিনী ও সিভিল আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের একটি অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গেছে। শুধু বেতনভোগী প্রশাসকের ও কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভূমিকা পালনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর পদগুলোর ক্ষমতাকে আরও নিরঙ্কুশ করার প্রয়াসে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ-উভয় দেশেই আমলাতন্ত্র সুসংহত de facto শাসক গোষ্ঠির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার ঝোঁকে আক্রান্ত হচ্ছে বারংবার। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো রাষ্ট্রের চরিত্রকে আমলাতান্ত্রিকতা নির্ভর করে ফেলা। এমতাবস্থায়, আমলাতান্ত্রিক চেয়ার ও পদগুলো অনুপার্জিত দুর্নীতিজাত খাজনা আহরণের মাধ্যমে প্রভূত পুঁজি

সঞ্চয়নের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, যার পরিণামে পুঁজি দুর্নীতির ফায়দাভোগী অনুৎপাদক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গের গোপন সিন্ধুকে বন্দী হয়ে যাবার প্রবণতা দিনদিন শক্তিশালী হতে থাকে। মুৎসুদ্দী পুঁজিপতি গোষ্ঠী যেহেতু বাণিজ্য থেকে মুনাফা আহরণ করে, তাই রাষ্ট্রের নীতি প্রণেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য-সহায়তা-আনুকূল্য ব্যতিরেকে এ ধরনের পুঁজির সমৃদ্ধি অর্জন দুরূহ। অতএব, রাষ্ট্র রাজনীতিকদের শাসনে আছে বলে বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হলেও মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে রাজনীতিকদেরকে যেমনি খাজনা দিতে হয়, আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির খাইও মেটাতে হয়। দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনে বাংলাদেশে 'রাজনীতিক-মিলিটারী আমলা-সিভিল আমলা-মুৎসুদ্দী বণিক পুঁজিপতি', - এ চারগোষ্ঠীর যে গ্র্যান্ড এলায়েন্স গেঁড়ে বসেছে তার পেছনে এ রাষ্ট্রের উপর্যুক্ত ধরনের আমলাতান্ত্রিক চরিত্রই প্রধানত দায়ী। রাজনীতির এই বৈশ্যকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হলে বৈধ বাণিজ্যের চাইতে 'স্মাগলিং' বেশি মুনাফাদায়ক হবে, বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণও বাণিজ্যে ধাবিত হবে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্সের সিংহভাগ 'হুন্ডি'র মাধ্যমে চোরাচালানে পাচার হয়ে যাবে কিংবা কালো টাকাকে সাদা করার জন্য (money laundering) ব্যবহৃত হবে, এবং এক পর্যায়ে বিদেশে পুঁজি পাচারের চক্রে হারিয়ে যাবে। রাষ্ট্র ক্ষমতা এভাবে যখন পুঁজি আহরণের লোভনীয় পন্থা হয়ে দাঁড়ায়, তখন ভোটের রাজনীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে 'ঘুষ ও ঘুষির' রাজত্ব হয়ে দাঁড়ানোই কি স্বাভাবিক নয়? আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে সন্ত্রাসী-মাস্তান- কালো টাকার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে রাজনীতির দুবৃত্তায়নের পেছনে আমাদের রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক চরিত্র ও মুৎসুদ্দী চরিত্রের উপরে বর্ণিত symbiosis পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

বাংলাদেশের বাজার ও ব্যক্তি খাত ঃ বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার সম্পর্ক ক্রম প্রসারমান হলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিশাল অংশ এখনো বাজার সম্পর্কের আওতা বহির্ভূত রয়ে গেছে। পরিবার এদেশে এখনো উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রয়ে গেছে। অর্থনীতির সর্ববৃহৎ ব্যক্তি খাত কৃষিতেও এখনো কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতি (Peasant Mode of Production) গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বহাল রয়ে গেছে, যেখানে বাজার সম্পর্কের অনুপ্রবেশ ক্রমবর্ধমান হলেও আত্মপোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় আত্ম-শোষণই (Self-exploitation) কিষাণ পরিবারের টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আমলে এবং বর্তমান নব্য-ঔপনিবেশিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কগুলো কৃষিতে দ্রুত অনুপ্রবেশে সক্ষম হলেও কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতিকে এখনো হটিয়ে দিতে সর্মথ হয়নি । অপরদিকে, ঔপনিবেশিক আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন এবং নানান কিসিমের ভূমি সংস্কারের নামে প্রতারণাপূর্ণ ও নামকাওয়াস্তে (cosmetic) পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় আধা-সামন্তবাদী অবশেষ হিসেবে বর্গাদার কৃষক, জোতদার ভূস্বামী, অনুপস্থিত ভূমি-মালিক, ইজারাদার, বন্ধকী শ্রম এবং মহাজনদের অবস্থান আমরা দেখতে পাই। আরো গুরুতর, মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী হিসেবে কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণের নানা পর্যায়ে ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার, পাইকার, মজুতদার এবং সুদখোর মহাজনদের কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। উপরন্তু, একটি জনবহুল ভূমি-দরিদ্র দেশে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় যে বিভাজন (Differentiation) প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তার ফলে ভূমিহীনতা, প্রান্তি-কীকরণ এবং নিঃস্বকরণ দিনদিন গতিলাভ করলেও এই বিভাজন আধা-সামন্তবাদী ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে মজুরী শ্রম-নির্ভর পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে পারছেনা। অথচ, ভূমির মালিকানা ব্যবস্থা দিনদিন

বৈষম্যমূলক হয়ে যাচ্ছে, যেখানে মালিকানা বদলের প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশী, দুর্নীতিবাজ আমলা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-সন্নিহিত লুটেরা নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের হাতে জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে। জোতদারদের অবস্থানেও চিড় ধরেছে। বর্গা ব্যবস্থা ও ইজারাদারি ছোট ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের নিজস্ব জমির অপর্যাপ্ততাকে সহনীয়ভাবে পুষিয়ে দেয়ারই একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পারিবারিক শ্রমের অশোষণ কৃষি উৎপাদনের নির্ধারক উপাদান হিসেবে বহাল থাকলেও কৃষির বাজার-নির্ভরতা উপকরণের দিক থেকে এবং উৎপাদ বাজারজাতকরণের দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই ক্রমবর্ধমান বাজার-নির্ভরতা কৃষক পরিবারের নিঃস্বকরণ ও প্রান্তিকীকরণকেই জোরদার করছে বিধায় দারিদ্র সৃষ্টিরই প্রক্রিয়া হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষকরা আমাদেরকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতা এনে দিলেও রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নের অগ্রাধিকার তালিকায় কৃষি সংস্কার এবং ভূমি সংস্কারকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অথচ, অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে বিবেকের তাড়নায় এটুকু মানতেই হবে, এই অবশ্য করণীয় দায়িত্বটি রাষ্ট্র এড়িয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখলে কৃষির বর্তমান সীমিত সাফল্য 'টেকসই' হবেনা।

পাকিস্তান আমল থেকেই রাষ্ট্র উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শিল্পায়নকে গতিশীল করার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে, যদিও ১৯৪৭-১৯৭১ পর্বে ঐ পৃষ্ঠপোষকতা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশেই প্রায় ৭৮ শতাংশ কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২-৭৫ পর্বের সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিতে শিল্পায়নের স্থবিরতা ও অব্যবস্থা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয়করণ-পরবর্তী অব্যবস্থাপনায় ও দুর্নীতির কারণে। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে শিল্পায়নে ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে ব্যক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে গড়ে তোলার ইতিহাসটা নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো, বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রথম কয়েক মাসের মতাদর্শিক দোদুল্যমানতার পর্যায়টা বাদ দিলে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রান্তিক অবস্থানের একটি দেশের অসহায় সাহায্য-ভিক্ষুকের যে অমর্যাদাকর অবস্থা, তার সাথে মানিয়ে চলার সাক্ষ্য বহন করছে ঐ ইতিহাস। একে একে জেঁকে বসেছে বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ, এডিবি, দাতা সংস্থা ও দাতাদেশগুলো। কিসিঞ্জার বাংলাদেশ ঘুরে যাবার পর অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনকে অপমানজনকভাবে বিদেয় করা হলো, ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়েগের সিলিং বাড়লো ধাপে ধাপে, বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচী জোরদার হলো, বিদেশী পরামর্শকরা নাজেল হলো, বৈদেশিক ঋণ/সাহায্যের অন্যায্য ও কঠোর শর্তগুলো হজম করা আবার শুরু হয়ে গেলো। শিল্পখাতে ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে নানারকম সুযোগ-সুবিধেও ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছিল ১৯৭৩-৭৫ পর্বে।

১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তি খাতের শিল্প কারখানার ৪৩ শতাংশ পুঁজির মালিকানা ছিল সরাসরি অবাঙালী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের করায়ত্ত। আবার, ঐ সময়ে (১৯৭০ সালে) পূর্ব পাকিস্তানের বৃহদায়তন ও মাঝারী আয়তনের আধুনিক শিল্পের মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানভুক্ত।১৯৭২ সালে ঘোষিত জাতীয়করণ কর্মসূচী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে গ্রহণ করা হলেও পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানা অধিগ্রহণের আবশ্যকতা মোটেও ফেলনা ছিলনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই এদেশের ক্ষমতা-সন্নিহিত নব্য পুঁজিপতিদের পুঁজি সঞ্চয়ন যতই এগিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকার পর্যায়ক্রমে ওসব পুঁজিপতির হাতে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগৃহীত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা হস্তান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৫

সালের ১৫ আগস্টের পূর্বেই অধিগৃহীত প্রতিষ্ঠানের দুই-তুতীয়াংশের বেশি আবার ব্যক্তিখাতের মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়েছিল। অবশ্য ওগুলোর অধিকাংশই ছোট প্রতিষ্ঠান ছিল, তাই অধিগৃহীত শিল্প-সম্পদের বড় অংশটাই তখনো রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে রয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার ১৯৭৬ সালে যে বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছিল তাতে পাকিস্তান আমলের ষাটের দশকের মত ব্যক্তি খাতকে আবারো উদার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য ব্যাংক ঋণ এবং বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ভান্ডার খুলে দেয়া হলো। ঐ নীতিরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে প্রণীত হলো নয়া শিল্প বিনিয়োগ নীতি, যেখানে ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করার জন্য উল্লিখিত নীতিমালা ছিল নিম্নরূপ :

১) ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়োগের সিলিং বিলোপ;

২) Free Sectors চালু করা হলো, যেখানে বিনিয়োগের জন্য সরকারী অনুমতি নিস্প্রয়োজন;

৩) শিল্প স্থাপনের জন্য উন্নত এলাকা, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উন্নত এলাকা এবং উন্নয়নশীল এলাকা নাম দিয়ে এলাকাভিত্তিক বিন্যাস চালু করা হলো, যার ভিত্তিতে নানাবিধ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মাত্রা নির্ধারণ করা যায়;

৪) যন্ত্রপাতি আমদানির উপর প্রযোজ্য শুল্ক হারে কনসেশন প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন;

৫) ট্যাক্স হলিডের আওতা সম্প্রসারণ;

৬) Accelerated Depreciation সুবিধে প্রবর্তন;

৭) রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উদার প্রণোদনা প্যাকেজ ;

৮) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উদার প্রণোদনা প্যাকেজ ; এবং

৯) দশ কোটি টাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন এবং তদুর্ধ পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য ECNEC এর অনুমোদন গ্রহণের নীতি প্রবর্তন।

Money is no problem স্লোগান তুলে ঐ সময়ে সরকার উদারভাবে পুঁজি বন্টনের যে ধারা শুরু করলো তার সিংহ ভাগই পরবর্তীতে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। বন্টিত ব্যাংক ঋণ শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত না হয়ে বৃহদাংশ বাণিজ্য ও সেবাখাতে ধাবিত হওয়ার ফলে ১৯৭৭ সাল থেকেই এদেশের আমদানি বিল হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। একই সাথে সামরিক বাহিনীর পেছনে সরকারী ব্যয় নাটকীয় গতিতে বাড়তে শুরু করে এবং সিভিল আমলাতন্ত্রের আয়তন এবং সুযোগ সুবিধেও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের প্রবাহও উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার হওয়ায় সরকারী এবং ব্যক্তি খাতে যুগপৎ সাময়িক স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, অচিরেই যখন বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে (Current Account of the Balance of Payments) ঘাটতি অসহনীয় হয়ে উঠতে শুরু করলো, তখনই ১৯৮০ সালে বাংলাদেশকে আইএমএফ এর Extended Fund Facility (EFF) এর অধীনে ঋণের জন্য হাত পাততে হলো। ঐ ঋণের শর্ত হিসেবে আইএমএফ বাংলাদেশের বাজেট প্রণয়ন নীতিতে, মুদ্রা নীতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে অনেকগুলো পরিবর্তনের সুপারিশ চাপিয়ে দিলো। ঐ সব সুপারিশের বেশিরভাগই সরকারের বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় শর্ত বাস্তবায়নে "ধীরে চলো নীতি" অবলম্বনের ফলে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুত ঋণের মধ্যে মাত্র ২০ মিলিয়ন ডলার ছাড় করণের পর ঐ ঋণ

প্রদান স্থগিত ঘোষণা করেছিল আইএমএফ। ১৯৮২ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৭৮ সালের ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতির প্রায় সবগুলোই ১৯৮২ সালের নতুন শিল্প নীতির (New Industrial Policy বা NIP) অঙ্গীভূত হয়, যাকে এদেশে "বাজার অর্থনীতি" প্রবর্তনের মাইলস্টোন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আশির দশকে আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোতে কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচী চালু করার শর্তাবলী সংবলিত Structural Adjustment Facility (SAF) এবং Extended Structural Adjustment Facility (ESAF) নামের ঋণ পদ্ধতি চালু করে, যেসব ঋণ-শর্তের প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১) রাষ্ট্রীয় খাতের ক্রম সংকোচনের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতকে অর্থনীতি ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকায় দৃঢ়মূল করা;

২) তাবৎ অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাজার বা দাম ব্যবস্থাকে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা প্রদান;

৩) বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর;

৪) আমদানি উদারীকরণ, শুল্ক হ্রাস বা বিলোপ, অশুল্ক জনিত বাধা-নিষেধ থেকে আমদানি প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে মুক্তিদান এবং আমদানির ক্ষেত্রে পরিমাণগত বাধা সমূহ ক্রমান্বয়ে বিলোপ;

৫) রপ্তানি চালিত শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল ক্রমান্বয়ে পরিহারকরণ;

৬) কৃষি উপকরণ এবং কৃষি পণ্যের দাম সহায়তা কর্মসূচী থেকে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি প্রত্যাহার;

৭) খাদ্য রেশন ব্যবস্থার ক্রম বিলোপ সাধন;

৮) রাজস্ব নীতি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি;

৯) বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগ নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি ও মুদ্রা নীতির উদারীকরণ;

১০) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং এদেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়যোগ্যতা বৃদ্ধি;

১১) বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, গ্যাস, টেলি যোগাযোগ, রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, নৌ-পরিবহন, বিমান পরিবহন প্রভৃতি খাত ক্রমান্বয়ে বেসরকারীকরণ;

১২) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমসংকোচন ও পর্যায়ক্রমিক বিরাষ্ট্রীয়করণ, এবং বীমা ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ;

১৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক খাত থেকে সরকারী ভূমিকা ও ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার এবং এসব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের প্রসার;

১৪) শেয়ার বাজার ও মূলধন বাজারের সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক পুঁজিকে ঐসব বাজারে উৎসাহ প্রদান; এবং

১৫) কৃষি উপকরণ সরবরাহ বেসরকারীকরণ।

১৯৮২ সালের নয়া শিল্পনীতি, ১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy বা RIP), ১৯৯০ সালের Policy Framework Paper স্বাক্ষর এবং ১৯৯৪ সালে উরুগুয়ে রাউন্ড GATT চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৯৫ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্র এখন পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছে "মুক্ত বাজার অর্থনীতির" মোড়কে আবৃত অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের উপর্যুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে।

বাংলাদেশের বাজারকে আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে দ্রুত উন্মুক্ত করার বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরের বাজেটে এবং আমদানি নীতিতে ঘোষিত আমদানি উদারীকরণ নীতিমালাকে কৃতিত্ব দেয়া হয়। গত ১৬ বছরে ধাপে ধাপে আমদানি উদারীকরণ আরো বহুদূর এগিয়েছে। এত দ্রুত লয়ে আমদানি উদারীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিদেশী পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ায় দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা বিনষ্ট হবার প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন এখন জোরেসোরেই উঠছে। বিষয়টার আরেকটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১) চৌদ্দ কোটি মানুষের দেশ হলেও বাংলাদেশ বাজার হিসেবে নেহাতই ক্ষুদ্র, জনগণের বৃহদাংশের ক্রয়ক্ষমতার স্বল্পতার কারণে। এ থেকে উদ্ভূত চাহিদার ঘাটতি বাংলাদেশে বাজারের আয়তন বৃদ্ধির পথে দুর্লংঘ্য বাধা। অন্যদিকে অর্থনীতির উৎপাদন কার্যক্রমের বড়সড় অংশটাই এখনো পরিবার ভিত্তিক ও আত্ম কর্মসংস্থান ভিত্তিক রয়ে যাওয়ায় এ সব কার্যক্রমে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে উৎপাদন চালানো হয়না। এমনকি আমাদের প্রধান খাদ্য শস্যেরও মাত্র এক চতুর্থাংশ বাজারে যোগান দেয়া হয়। অথচ, কৃষি খাতের উপকরণ গুলোর জন্য কৃষকের বাজার নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। এমতাবস্থায়, খাদ্য সাহায্যের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের বাজার দামকে কৃত্রিমভাবে দাবিয়ে রাখায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য "দাম সিগন্যাল" প্রণোদনা যোগাতে পারছেনা, খোরাক যোগানের তাগিদেই কৃষক প্রাণের দায়ে উৎপাদন চালিয়ে যাবে, না পোষানো সত্ত্বেও। আমাদের সংবিধানে বিধৃত "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার" এর অঙ্গীকার দাবী করবে, এ অবস্থায় কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দেওয়া এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে দাম সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেসক্রিপশন ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে বলছে এবং আমদানি উদারীকরণের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বাজারকে আরো সংকুচিত করে দিচ্ছে।

২) প্রতিবেশী বৃহদাকার অর্থনীতির দেশ ভারতের তুলনায় দ্রুততর গতিতে আমদানি উদারীকরণের মাশুল হিসেবে বাংলাদেশে চোরাচালান প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এর গতি প্রকৃতিও বদলে গেছে। বাংলাদেশের বৈধ আমদানি এবং অবৈধ আমদানি উভয়ই ভারতে এবং মায়ানমারে পাচার বেড়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাজার দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশীয় দেশগুলোর পণ্যের পাশাপাশি বিশেষতঃ ভারতীয় পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে, তা সে পণ্য বৈধ বা অবৈধ পথে আসুক।

৩) ১৯৪৭ সাল থেকে গড়ে উঠা "সংরক্ষিত শিশু শিল্প" নামের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত শিল্প কারখানাগুলো সংরক্ষিত বাজার হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। আর যে সব শিল্প শুধু

কর্মসংস্থান সৃষ্টির যুক্তিতে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন দর্শনের ছত্রছায়ায় উদার রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল সেগুলো রুগ্ন হয়ে মরতে বসেছে, আমদানিকৃত বা চোরাপথে আনীত বিদেশী পণ্যের কাছে বাজার হারিয়ে।

৪) রপ্তানি বাণিজ্যে Multi-Fiber Arrangement (MFA) এবং Generalized System of Preferences (GSP) এর কোটা ব্যবস্থার ফায়দাভোগী হয়ে এদেশের গার্মেন্টস্ শিল্প ২০০১ সাল পর্যন্ত চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছিল। অনেকে এ সাফল্যকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সুফল হিসেবে দেখাতে চাইলেও

বাস্তবতা হলো, ২০০৫ সালে WTO এর উদ্যোগে পোষাক শিল্পের জন্য প্রযোজ্য Agreement on Textile and Clothing (ATC) চালু হলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্প বিপদে পড়বে, কারণ এই শিল্পের ফরওয়ার্ড লিংকেজ এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কোনটার ব্যাপারেই আজো আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। বরং, দেশীয় বস্ত্রশিল্প ভারতীয় চোরাচালানে যেমনি পর্যুদস্ত হচ্ছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে গার্মেন্টস্ শিল্পের "লিকেজ" সমস্যার কারণে। চিংড়ী রপ্তানিও ইদানিং দাম এবং উৎপাদন বিপর্যয়ে পড়েছে। পাট, চা ও চামড়ার মত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি পণ্যের অবস্থাও ভাল যাচ্ছেনা।

৫) জনশক্তি রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স পুরো অর্থনীতিকে ভাসিয়ে রেখেছে বলা চলে। কিন্তু "হুন্ডি" প্রক্রিয়ায় রেমিট্যান্সের বড় অংশটাই চোরাচালান, Capital Flight, বিদেশে পড়াশোনা ও চিকিৎসার খরচ মেটানোর মত কাজে হারিয়ে যাচ্ছে। অদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তির পরিবর্তে দক্ষ ও প্রযুক্তি-জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ রপ্তানি করতে পারলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয় হতে পারতো। কাঠামোগত সংস্কারের প্রেসক্রিপশন মানব উন্নয়নে অপরিহার্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে বাজারের হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য করছে আমাদেরকে। পুরো শিক্ষা খাত এখন বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য খাতের বাজারীকরণ জনগণকে দেউলে করার মহাযজ্ঞে পরিণত হয়েছে।

৬) মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেসক্রিপশন প্রতিরক্ষা, প্রশাসন কিংবা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মত অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে সরকারী ব্যয় কমানোর পরামর্শ দেয়না। বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে কৃষককে ভর্তুকি থেকে খারিজ করছে রাষ্ট্র, অথচ বাজার অর্থনীতির কোন্ তত্ত্ব বা নীতির বলে উপর্যুক্ত খাত গুলোর নানাবিধ ভর্তুকি অব্যাহত থাকছে তার কোন ব্যাখ্যা মিলবে না।

৭) বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, নৌ-পরিবহন, বিমান যোগাযোগ--এগুলো সবই প্রাইভেট দ্রব্য ও সেবা, কিন্তু এগুলোর উৎপাদনে স্থির খরচ হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় বলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে এগুলোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় খাতে গড়ে তুলতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য গেঁড়ে বসায় এদেশে "সিষ্টেম লসের" যে মারাত্মক প্রাদুর্ভাব অর্থনীতিকে জিম্মি করে ফেলেছে তা থেকে জনগণের পরিত্রাণ মিলছে না। বাজার অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে Public Utilities নামে পরিচিত এসব প্রাইভেট দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন এবং বিতরণ রাষ্ট্রীয় খাতে বহাল রেখে দেয়ার জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা কায়েমী স্বার্থ এসব প্রতিষ্ঠানে মৌরসী পাট্টা গেঁড়ে বসেছে। ভুক্তভোগী জনগণ এসব

প্রতিষ্ঠানের হরির লুটের অসহায় শিকার। অথচ রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতারা ঘন ঘন দাম বা Tariff বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ক্ষমতাসীন মহলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর দুর্নীতি ও লুটপাটের বোঝাটা বারংবার সুচারুরূপে পার করে দিচ্ছে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ গ্রাহকদের কাঁধে। এসব দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও বিতরণ ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিলে দক্ষতা বাড়ানো যায়, তা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

৮) বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাইভেটাইজেশনকে উৎসাহ প্রদানের কথা বলা হলেও এদেশে তা প্রধানত বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচীতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এমনকি, রুগ্ন হয়ে পড়া অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত কল কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণও করা যায়নি উপযুক্ত দাম দিয়ে কেনায় আগ্রহী ক্রেতা না পাওয়ায়। যে সব প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি স্রেফ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং অনেকগুলোর যন্ত্রপাতি এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে নব্য-মালিকরা সট্‌কে পড়েছেন। পানির দামে বিরাষ্ট্রায়ত্ত অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান রুগ্নতার নিশান তুলে কিস্তির টাকা পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব, বাংলাদেশে শিল্পায়নের সমস্যাকে স্রেফ প্রাইভেটাইজেশন বনাম রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মালিকানার বিতর্কে সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা অতি সরলীকরণেরই নামান্তর।

৯) দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার খেলাপি ঋণ সমস্যা এবং পুঁজি লুণ্ঠনের অব্যাহত কেলেংকারি থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে যে শুধু ব্যক্তি খাতের ব্যাংকিং দিয়ে বাংলাদেশের ঋণ বাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের প্রবেশাধিকারও মিলবেনা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ লোপাটের খেলাও বন্ধ করা যাবে না। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত কঠোর Regulatory System এবং কার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা গড়ে না তুললে ব্যাংকিং ব্যবস্থার শনিদশা কাটবে না। শেয়ার বাজার শক্তিশালী না করে ব্যাংকিং সিষ্টেমকে বিনিয়োগ পুঁজি যোগানোর দায়িত্ব দিলে খেলাপি ঋণ সমস্যা থেকে ব্যাংকিং সিস্টেম মুক্তি পাবে আশা করা বাতুলতা বই কি !

১০) বাংলাদেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমদানি উদারীকরণই অপেক্ষাকৃত অগ্রসরমান প্রক্রিয়া। আইএমএফ-বিশ্ব ব্যাংক-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ত্রিমুখী Overlordship এবং নিরন্তর জবরদস্তিমূলক চাপাচাপির মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজার অর্গলমুক্ত করার আয়োজন "মুক্ত বাজার অর্থনীতি"। প্রতিযোগিতার নামে পাহলোয়ানের সাথে শিশুর কুস্তি মোটেও মানায়না। আবার, বছরের পর বছর প্রটেকশন দিয়ে তথাকথিত শিশু শিল্পকে চিরকাল অদক্ষ ও সরকারী সহায়তা নির্ভর করে রাখারও কোন মানে হয় না। বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে যত্রতত্র শুল্ক ও মূসক (VAT) বসিয়ে রাজস্ব আহরণও নিরুৎসাহিত করা উচিত। শুল্ক ও মূসক সংগ্রহে নিয়োজিত আমলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর "খাজনা-আহরণের" স্বার্থে আমদানি বাধা-নিষেধ যথেচ্ছ আরোপেরও অবসান হওয়া প্রয়োজন। অর্থনীতির যুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চোরাচালান উৎসাহিত করার জন্য শুল্ক-VAT-বাধা-নিষেধ-নিয়ম-কানুনের বহর বৃদ্ধির পুরানো রোগটাও সারাতে হবে। কিন্তু তারপরও বলবো, এদেশের আমদানিতে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস দ্রব্যের যে সমারোহ, তা বাংলাদেশকে মানায় না।

১১) ব্যক্তি খাতকে উৎপাদনে উৎসাহিত করতে চাইলে আইনের শাসন দৃঢ়মূল করা এবং শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা একেবারেই প্রাথমিক শর্ত। পরপর দু'বছর বাংলাদেশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। সন্ত্রাস-মাস্তানি-

চাঁদাবাজি এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতি এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজকে মহা-দুর্যোগের পানে ধাবিত করছে। রাজনৈতিক প্রশ্নে সারা জাতি আজ দ্বিধা-বিভক্ত। ঝগড়াটে রাজনীতি গণতন্ত্রকে উপহাসে পরিণত করেছে। বিচার ব্যবস্থা থেকে জনগণ আর সুবিচার আশা করতে পারছে না। দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় পুলিশ বিভাগ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, TIB এর গবেষণা মোতাবেক। রাষ্ট্র এবং রাজনীতির ব্যর্থতার কারণে সুশাসনের সংকট এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচে' বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত ?

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা উচিত, মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতিমালাকে আমাদের অর্থনীতির "সর্বরোগহর বটিকা" হিসেবে বিবেচনা করা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারী খাতের ব্যর্থতা যেমনি প্রমাণিত সত্য, তেমনি বন্টনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের মত পরনির্ভরতা-জর্জরিত স্বল্পোন্নত দেশের আত্ম-নির্ভর উন্নয়ন অর্জনের জন্য অর্থনীতির "কাঠামোগত রূপান্তর" (Structural Transformation) অপরিহার্য, কিন্তু এই রূপান্তরের বিষয়টি আমাদের দাতা-প্রভুদের চাপিয়ে দেয়া প্রেসক্রিপশনের চাইতে অনেকাংশেই আলাদা। বরং, প্রেসক্রিপশনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ নীতিই এদেশের আত্ম-নির্ভরতা (Self-reliance) অর্জনের একবারেই পরিপন্থী। একথা মানতেই হবে, এক্ষণে উন্নয়নের কোন পরীক্ষিত সফল "মডেল" আমাদের সামনে নেই। কিন্তু, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কিছু চিন্তাভবনা তুলে ধরা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মত নব্য-ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দী চরিত্রের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় চরিত্রই উন্নয়নের পথে সবচে' বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত মনে করি। কারণ, এদেশের রাষ্ট্র উৎপাদনশীল জনগণের স্বার্থের পাহারাদার না হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী অধিপতি গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত "রাজনীতিক-মিলিটারী ও সিভিল আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজিপতি" এর গ্র্যান্ড এলায়েন্সের খাজনা ও মুনাফা আহরণের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার পরিণামে "উদ্বৃত্ত" আত্মসাতের প্রধান ধারাটির পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অথচ, এর সমাধান হিসেবে উৎপাদন ও বন্টন থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুটিয়ে নিয়ে বাজার অর্থনীতিকে বিকল্প হিসেবে Pre-dominance দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলে তা আরো ক্ষতিকর ফলাফল বয়ে আনতে পারে। নিউ-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির বাজার ব্যর্থতা তত্ত্ব (Theory of Market Failure) বলছে :

১) বাজার অর্থনীতি শ্রমজীবী জনগণকে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার করবে।

২) বাজার অর্থনীতি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনবায়নযোগ্য সম্পদ (যেমন, গ্যাস), পরিবেশ ও প্রতিবেশ অপচয়মূলকভাবে নিঃশেষ করে দেবে।

৩) বাজার অর্থনীতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সরবারাহ, সেনিটেশন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ইত্যাদি দ্রব্য ও সেবা সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণে উৎপাদিত হবে না এবং সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে এগুলো থেকে অধিকতর হারে বঞ্চিত করবে।

৪) বাজার অর্থনীতির তথাকথিত প্রতিযোগিতা আমাদের মত দেশে অদূর ভবিষ্যতে অলীক স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ, প্রান্তীয় পুঁজিবাদে বাজারের প্রতিযোগিতা এক ধরনের "মাৎস্যন্যায়" প্রতিষ্ঠাই করে থাকে, যেখানে বৃহৎ পুঁজিপতিরা ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশকে পদে পদে বিঘ্নিত করতে থাকবে।

৫) বাজার অর্থনীতি মাদকদ্রব্য ও মদ উৎপাদন, অশ্লীল ছায়াছবি, অপসংস্কৃতি, জুয়াখেলা, ঘোড়দৌঁড়, ক্যাসিনো-ক্লাব-পতিতালয়ের মত ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন ও সেবা প্রতিষ্ঠানের পেছনে সামাজিক সম্পদ অপচয় করে।

৬) বাজার অর্থনীতি সামাজিক ন্যায় বিচারকে সমন্নত রাখতে ব্যর্থ বিধায় গণদারিদ্র, বেকারত্ব, জনসংখ্যা সমস্যা, নিরক্ষরতা, বুভুক্ষা ও পুষ্টিহীনতা সমস্যার অবসান ঘটাতে অপারগ, কারণ বাজার ব্যবস্থা বৈষম্য বৃদ্ধি ও লালন করেই শক্তিশালী হবে।

অতএব, উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়েছে একথা প্রমাণিত হওয়ার মানে এই নয় যে, সামাজিক ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা বিধান, মানব উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত ও আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক অবকাঠামোর বিকাশ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাজারের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া যাবে। রাষ্ট্র যদি প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সিভিল আমলাতন্ত্র, প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারী ব্যয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়, তাহলে যে ব্যয় সাশ্রয় হবে তা দিয়ে উপরে উল্লিখিত সামাজিকভাবে কাম্য কার্যক্রমগুলোতে রাষ্ট্র অর্থবহ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হবে, তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

এশিয়ার "সফল" দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে, শিল্পায়নে সাফল্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব দেশে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সুদূর প্রসারী কৃষি সংস্কার কর্মসূচী সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন ও ইসরাইলের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান নক্ষত্রের মত দেদীপ্যমান।

উন্নয়নের পথে সফল দেশগুলোর ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে, মানব উন্নয়নে সত্যিকার সফল কোন দেশ বেশি দিন উন্নয়নের দৌঁড়ে পিছিয়ে থাকে না। অতএব, এদেশে সর্বজনীন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান নির্ভর, বৈষম্যহীন ও সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ন্যূনতম সময়ে নিরক্ষরতা নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ও প্রয়াস চালানো জাতীয় উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান লাভের দাবী রাখে।

ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রশ্নটিও সুচিন্তিত বিবেচনার দাবী রাখে। রাষ্ট্র এদেশে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে কৃষিখাত থেকে, আর ভর্তুকি বহাল রাখছে বিভিন্ন বাহিনীর রেশনে, আমলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর নানান কিসিমের "ফ্রি" বা সস্তা সুবিধেগুলোতে -বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফার্নিশ্‌ড কোয়ার্টার, শোফার চালিত গাড়ী, টেলিফোন, জমির প্লট, ইত্যাদিতে।

ব্যাংক ঋণ নিয়েও কঠোর চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা সময়মত ফেরৎ দেয়ার অঙ্গীকার করে যে ঋণ গ্রহীতা সে অঙ্গীকার রক্ষা করবেন, তাঁকে মান্ধাতা আমলের বস্তাপঁচা সহ-জামানত বা বন্ধকী প্রথার অজুহাতে ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত রাখার কী যুক্তি থাকতে পারে ? বাংলাদেশের ধনাঢ্য ঋণ গ্রহীতারা এখনো প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার খেলাপি ঋণের পাহাড়ে বসে রয়েছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমিহীন ও বিত্তহীন পরিবারের নারী সমাজ তাঁদের গৃহীত ঋণ ফেরৎ দেয়ার রেকর্ড অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন। অথচ, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (Formal) ঋণ-বাজার

এসব উৎপাদনশীল নারীকে অবহেলা করে চলেছে। পাশাপাশি, ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের প্রতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি এবং গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কার্যক্রমের প্রতি ব্যাংকিং সিষ্টেমের অনীহা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাংক ঋণকে এসব ক্ষুদ্র অথচ উৎপাদনশীল উদ্যোক্তাদের দিকে ফেরাতে হবে। বড়র পীরিতি থেকে মুক্ত করে ব্যাংককে জনগণের পুঁজির জন্য হাহাকারকে মেটানোর লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে হবে।

বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণের ব্যাপারেও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য এবং জিডিপি'র অনুপাত ১৩.২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ তা জিডিপি'র ৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। তাই বাংলাদেশকে এখন ঋণ নির্ভর দেশ না বলে বাণিজ্য নির্ভর দেশ বলাই সমীচীন। একটা বোগাস্ আশংকা জাতিকে পেয়ে বসেছে যে বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। এই অমূলক আশংকাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি। অবশ্য, এটাও বলা প্রয়োজন, আত্মনির্ভর উন্নয়নের ধারণা বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় না। ঋণ গ্রহণে বা বর্জনে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সার্বভৌমত্ব অর্জনই গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক বিনিয়োগের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। বর্তমানে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ধরন এবং অর্থনীতির জন্য এর উপযোগিতা গভীরভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে এমন প্রতীতীই জন্মায় যে, অধিকাংশ প্রকারের বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারে তেমন কোন হেরফের ঘটায় না। বরং এই প্রকল্পগুলো অর্থনীতিতে কতগুলো পুঁজি-লুটেরা গোষ্ঠীকে লালন করছে। এ প্রসংগে এনজিও কার্যক্রমেরও একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের আবশ্যকতা অনুভব করছি।

আত্মনির্ভর উন্নয়নের অন্বেষায় শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতায়নের এবং তাঁদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি বারবার সামনে চলে আসবে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহিমূলক ও নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলা অপরিহার্য মনে করি। শ্রমজীবী জনগণের নিজেদের উদ্যোগে গঠিত ব্যবস্থায় সমবায় এবং অংশগ্রহণমূলক স্ব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপযোগিতাও আজো হারিয়ে যায়নি। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ষ্টার্ন গণচীনের চমকপ্রদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চীনের Township and Village Enterprise (TVE) গুলোর ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মূল্যায়ন করেছেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার এই মডেলের শিক্ষা সরাসরি গ্রহণ করা যেতে পারে।

তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির চলমান বিপ্লব থেকে বাংলাদেশ উল্লেখ্যযোগ্য কোন ফায়দা তুলতে পারছেনা, অথচ এখানেই হয়তো বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র মুক্তির স্বর্ণ-সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

উপরের করণীয়গুলোতে রাষ্ট্র এবং বাজার উভয়েরই যথাযথ ভূমিকা পালন অপরিহার্য। মুক্ত বাজার অর্থনীতি তো আসলে পুঁজিবাদই। পুঁজির শোষণ ও লুণ্ঠন কি মিথ্যে হয়ে গেছে? বৈষম্যের যে ক্রমবর্ধমান ধারা মানুষকে মানবেতর প্রাণীর মত অস্তিত্ব রক্ষার দৈনন্দিন সংগ্রামে ঠেলে দিয়ে নিরন্তর দারিদ্র সৃষ্টি করে চলেছে তারই ধারক ও লালনকর্তা তো এই পুঁজিবাদ। বৈষম্য, শোষণ ও পুঁজি-লুণ্ঠন ভিত্তিক পুঁজিবাদই কি মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ? বিশ্বের সকল দেশেই শ্রমজীবী জনগণ পুঁজির শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বুকে লালন করে। বিকল্পের সন্ধান না পেয়ে তাঁরা কি পুঁজিবাদকেই নিয়তি হিসেবে বরণ করে নেবে? উপরের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে গেলেই নিজের বিবেক থেকে জবাব মিলবে, বিকল্প সমাজের অন্বেষা কখনোই থামতে পারেনা।

একুশ শতকে বিশ্ব পুঁজিবাদ তৃতীয় বিশ্বকে পুনঃউপনিবেশকরণের (Re-colonisation) প্রয়াস আরো পোক্ত করবে। ভোটের রাজনীতিকেও এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী মডেল অপব্যবহার করছে। রাজনীতির বৈশ্যকরণ (Commercialisation) এবং দুবৃত্তায়নের (Criminalisation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব তথাকথিত জনপ্রতিনিধি এহেন ভোটের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হচ্ছেন তাঁরাও বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত সেবাদাসের ভূমিকা পালন করবেন এটা প্রায় নিশ্চিত। তাই প্রগতিশীল সামাজিক রূপান্তরের প্রয়াস রাষ্ট্র চরিত্র বদলানোর সংগ্রামকে ধারণ করতেই হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই উপসংহারে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও বাজার সম্পর্কে নীচের কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো :

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও বাজারের দায়িত্ব বণ্টন ঃ কিছু প্রস্ড়াব

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও বাজারের ভূমিকার সঠিক বিভাজন ও সমন্বয়ের দিক্ নির্দেশনা হিসেবে নিম্নে উল্লিখিত ইস্যুগুলোর অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য :

১) অর্থনীতির বৃহত্তম ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদনী খাত কৃষিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার এবং কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে গুরুত্ব দিতে হবে। জমির মালিকানার সিলিং অবনমনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন যেমনি এরূপ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি বর্গা প্রথার সংস্কার, খেতমজুরদের অধিকার সংরক্ষণ, কৃষি ঋণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, খাস জমিতে সমবায় খামার বা যৌথ খামার গঠন& এসবও কৃষি সংস্কারের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২) অর্থনীতির সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং ব্যক্তি উদ্যোগের যৌক্তিকতার সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিমিত মাত্রায় বাজার ব্যবস্থাকে উৎপাদন সংগঠনে ব্যবহার করা। উৎপাদনের দক্ষতা অর্জনে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যর্থতার আলোকে রাষ্ট্রকে বাজার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক (Regulator), সহায়ক (Facilitator) এবং শাসকের (Governor) ভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করতে হবে। রাষ্ট্র উৎপাদকদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। বাজারের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র নিয়ম-নিষ্ঠ রেফারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

৩) উৎপাদন থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের গন্তব্যকে রাষ্ট্র দিক্ নির্দেশনা দেবে। পুঁজির কেন্দ্রিকরণ বা পুঞ্জিভবনকে রাষ্ট্র প্রতিরোধ করবে, কিন্তু সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরে অর্থ বাজার এবং পুঁজি বাজারকে রাষ্ট্রীয় কিংবা রাজনৈতিক জবরদস্তির শিকার করবেনা। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি পর্যায়ের ব্যক্তি খাতের উদ্যোগকে রাষ্ট্র কার্যকর সহায়তা দেবে, বড় এবং ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।

৪) অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বাজার ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে না দেখে পরিপূরকের ভূমিকা পালনের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে (Structured বা Governed Market)।

৫) একুশ শতকে শিল্পোৎপাদন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে বৃহদাকার শিল্প-কারখানার ধারণা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। Components ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিগত ধারায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, প্রযুক্তিজ্ঞান সমৃদ্ধ "মানব পুঁজি"ত এ সবই একটি দেশের তুলনামূলক সুবিধের প্রধান নির্ধারক হয়ে গেছে। তাই একক মান সম্পন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। মতাদর্শিক বা ধর্মীয় জোয়াল যেন শিক্ষার মানকে কোনভাবেই ব্যাহত করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাথে যেন শিক্ষা ব্যবস্থার কোন দূরত্ব সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনগুলোকে।

৬) অর্থনীতির যাবতীয় কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও মেধার যথাযথ প্রণোদনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। একই সাথে জবাবদিহিতার ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।

৭) রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে ধারণ ও লালন করতে হবে। একের ধর্ম পালন অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যেন কোনভাবেই বিঘ্নিত না করে, তারই সজাগ প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে রাষ্ট্র। এমনকি, আস্তিকতা-নাস্তিকতা প্রশ্নেও কোন পক্ষাবলম্বন করবে না রাষ্ট্র। একই সাথে, ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অপপ্রয়াসকে কঠোরভাবে দমন করবে রাষ্ট্র।

৮) দেশের বিচার ব্যবস্থাকে নির্ভেজাল স্বাধীনতা দিতেই হবে। বিচার ব্যবস্থা যেন সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকে তারও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৯) আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ক সংস্থার ছড়াছড়ি, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের (সিভিল ও মিলিটারী উভয় প্রকারের) বিশেষ সুবিধেভোগী গোষ্ঠী হিসেবে গণবিরোধী "শ্রেণীতে" রূপান্তর, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ-এগুলোকে পরিহার করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার কোনই বিকল্প নেই।

১০) একক মানসম্পন্ন আধুনিক, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো।

১১) সংবাদপত্র - রেডিও - টেলিভিশনের মতো মতপ্রকাশের মাধ্যমগুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা, সাহিত্য, সিনেমা ও নাটককে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অর্গলমুক্ত করতে হবে।

১২) উৎপাদনকে দক্ষ ও গতিশীল করার প্রয়োজনে রাষ্ট্র ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলবে, তবে সেগুলোর পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং সংগঠিত ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ কার্যকর এজেন্ট হতে পারে। Public Utilities সরবরাহে ব্যক্তি খাত এগিয়ে এলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনই যথাযথ হবে দক্ষতা ও ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে।

১৩) রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার জন্য বৃহদাকার সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণ বাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলবে, যাতে বৈদেশিক আগ্রাসনের আশংকা দেখা দিলে পুরো জাতিকে ন্যূনতম সময়ে মাঠে নামিয়ে দেয়া যায়। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রতিরক্ষা খাতে যে সরকারী ব্যয় সাশ্রয় হবে রাষ্ট্র তা বরাদ্দ করবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ উন্নয়ন খাতগুলোতে।

১৪) রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি দেশের পুরো উৎপাদন ব্যবস্থাকে যেভাবে তছনছ করে দিচ্ছে তাতে বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের বদনাম ঘোচানোর জন্য রাষ্ট্র অবিলম্বে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গড়ে তুলবে এবং সংবিধানে বিধৃত ন্যায়পাল ব্যবস্থা কায়েম করবে ।সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রাষ্ট্রের জন্য ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে 'রাষ্ট্র ব্যর্থতা'কে (State Failure) সংকটজনক পর্যায়ে উন্নীত করেছে । জনগণ পরিত্রাণ চায় । কিন্তু, তার জন্য জনগণকেই রুখে দাঁড়াতে হবে । বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জনগণকে এই সম্মেলন থেকে এ-গণপ্রজাতন্ত্রে নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে ।

সুধী মন্ডলী,

ধৈর্য সহকারে বক্তব্য শোনার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন ।সম্মেলনের সকল কর্ম-অধিবেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

খোদা হাফেজ । বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।